

পায়রাগুলোকে অবাধে উড়তে দিন পরীক্ষিং চৌধুরী

যখন বয়স ১৯, চোখের সামনে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই বয়সেই যুদ্ধের উৎকণ্ঠা, বিভীষিকা, নির্মমতা ও এর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুস্থ ও অনাহারীদের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী দিতে গিয়ে আরো কাছে থেকে দেখলেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কাজ করেছেন লজারখানায়। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই উদ্ধার করেছেন। এসমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই শান্তি, মুক্তি ও মানবতা বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড, চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল।

তাই তো তিনি বলতে পারেন, ‘আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হোক। তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।’ এটি শুধু মুখে বলেননি, বাস্তবায়নেও সচেষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রথমে জোর দিয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ওপর।

বিশ্বরাজনীতিতে তখন দুই মোড়লের দুটো ব্লক। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে, অপরটি সোভিয়েত ইউনিয়নের গাঁটছড়ায়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিক্ষস্ত বাংলাদেশ কোন দিকেই মাথা বিক্রি করলো না। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘আমরা সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল।’ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে তিনি সংবিধান প্রণয়ন করলেন।

একসময় ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল ছিলেন আর্চার ব্লাড। ‘দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ’ বইয়ে স্মৃতিচারণ করে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুরক্ত এই ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ এর অক্টোবরে আর্চার ব্লাডকে বিদেশনীতি প্রশ্নে বলেছিলেন, ‘আমি ভারতপন্থী নই, আমেরিকাপন্থী বা চীনপন্থী নই; আমি আমার জনগণপন্থী।’ তিনি যুদ্ধবিক্ষস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন করেই থেমে থাকেননি। ১৯৭২ থেকে ৭৫ সালের আগস্ট, এই সাড়ে তিন বছর, স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি আদায় ও অর্থনীতি পুনর্গঠনে বিদেশি সহায়তা পেতে, নানা দেশে যেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। আর ধীরে ধীরে মহাপরাশক্তিধর দুই জোটের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত এক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি একই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি এবং সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার পাশাপাশি বাঙালি জাতিকে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বৃহত্তর সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে স্কুলজীবন থেকে শুরু হয়েছে কারাবরণ। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দুবার। তবু তিনি শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত হননি। আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে সব আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন ও বিশ্ব রাজনীতিতে অবস্থান বিবেচনা করে বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর ‘জুলিও কুরি’ পদকের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করে। ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রেডেরিক জোলিও কুরি এবং স্ত্রী ইরেন কুরি যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রেডেরিক গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। পরে তিনি নিজে বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতিও ছিলেন। ১৯৫৮ সালে ফ্রেডেরিক মৃত্যুবরণ করলে ১৯৫৯ সাল থেকে বিশ্বশান্তি পরিষদ তাদের শান্তি পদকের নাম রাখে ‘জুলিও কুরি’।

মূলত, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং মানবতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যঁারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা এই পদকে ভূষিত হয়ে আসছিলেন ১৯৫০ সাল থেকে। একটা সময় পর্যন্ত ‘জুলিও-কুরি’ শান্তি পুরস্কারের মর্যাদা শান্তিতে নোবেলের চাইতে অনেক বেশি ছিল। এই পদকপ্রাপ্তির তালিকায় নাম আছে ফিদেল কাস্ত্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, পাবলো নেবুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, লিওনিদ ব্রেজনেভের মতো প্রমুখ বিশ্ব নেতাদের।

২৩ মে, ১৯৭৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় জুলিও কুরি পদক। সেদিন এশীয় শান্তি সম্মেলনের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে পদক পরিয়ে দেন পরিষদের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র। সেই অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু।’ ‘বঙ্গবন্ধু’ হয়েছিলেন আগেই, সেই ১৯৬৯ সালে। এবার হলেন বিশ্ববন্ধু।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘এ সম্মান আমার নয়, এ সম্মান লক্ষ লক্ষ শহীদের, নির্যাতিত বোনদের, আমার মুক্তিযোদ্ধা ও পশু ভাইদের। বাংলার দুঃখী মানুষের, সাড়ে সাত কোটি

জনসাধারণের, এ সম্মান বাংলার জাগ্রত মানুষের, যারা সংগ্রাম করেছে শান্তির জন্য। শান্তি আনতে হলেও সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। অত্যাচার, অবিচার, জুলুমের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ দাঁড়াতে জানে। সে প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়।’ হানাহানি, দাঙ্গা, মারামারি, যুদ্ধ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করতে সেদিন বঙ্গবন্ধু বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানবতার মুক্তির জন্য সম্মিলিতভাবে যে কোন সংঘাত মোকাবিলার প্রত্যয় ঘোষণার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল বলেই শেখ মুজিবকে ‘জুলিও-কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত করে বিশ্ব শান্তি পরিষদ।

দেশি-বিদেশি শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে তাঁর নেতৃত্বে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃত বিশ্ববন্ধুর মতই বলেছিলেন, ‘আমরা জানি, মুক্তিকামী মানুষের ন্যায়সংগত সংগ্রাম অস্ত্রের জোরে শুরু করা যায় না। সে জন্য ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাউসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতি আমরা জানিয়েছি অকুণ্ঠ সমর্থন। আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি অন্যায়াভাবে ইসরায়েল কর্তৃক আরব এলাকা জোরপূর্বক দখলে রাখার বিরুদ্ধে। আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে নিন্দা করি দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের সকল স্থানের বর্ণভেদবাদী নীতির। আমরা সমর্থন জানাই বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও মানবকল্যাণের যেকোনো মহৎ প্রচেষ্টাকে।’

বঙ্গবন্ধুর বৈরীবিহীন কূটনীতির সুফল পাওয়া গেল হাতেনাতেই, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়াসে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করে। অনেকগুলো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলন শেষে ঘোষণাপত্রে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো তাদের সমর্থন দেয়। আলজিয়াসের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আরব দেশের নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি পর্যায়ে বৈঠক ও আলাপ-আলোচনার ফলে এক দিনে প্রায় ১৬টি আরব ও আফ্রিকান দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ওই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন- ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম আজও অব্যাহত ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, গিনি বিসাউসহ লাতিন আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাই একটি বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়তে আমাদের সবাইকে এক হয়ে শোষিতের পক্ষে দাঁড়াতে হবে।’ পরদিন ৯ সেপ্টেম্বর বিদায়ী ভাষণেও বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন- ‘উপমহাদেশকে শান্তিপূর্ণ রাখতে হলে, যে কোনো সমস্যার মানবিক সমাধান খুঁজতে হবে। একটি সমৃদ্ধ বিশ্বের জন্য আমাদের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের ওপর জোর দিতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সদস্য দেশগুলোর পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার প্রত্যয় দেশগুলোর সামাজিক সমৃদ্ধি আনতে পারে।’

১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ঐ বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপনে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন- ‘বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব- এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা- বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি। আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।’

তিনি ঘোষণা করেন- ‘শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সংপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।’

‘জুলিও কুরি’ পদক প্রাপ্তির ৫০তম বার্ষিকী পালনের সময় আজকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ‘জুলিও কুরি’ পদকপ্রাপ্তির ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর সেদিনের উচ্চারণ কি আজও সমান প্রাসঙ্গিক নয়? যখন মনে হয় ‘আজো নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস’। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বজুড়ে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া; সিরিয়া, সুদান, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তানসহ বিশ্বব্যাপী মানবতার বিপর্যয়, আমাদের মনে করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর ‘শান্তির ললিত বাণী’-বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বীজমন্ত্র। পৃথিবীতে যখন আজো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, মানুষের ন্যায় স্বাধীনতা খর্ব হয়, শোষণের ঘটনা ঘটে, তখন বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট উচ্চারণ মনে পড়ে- ‘পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।’ সেই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতবছর ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তাগিদ দিতে বিশ্ব শান্তির প্রতি জোর দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘যুদ্ধ চাইনা, শান্তি চাই; মানবকল্যাণ চাই। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। যে কোন ধরনের সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোচ্চ উপায় হলো সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান। শান্তি ও স্থিতিশীলতা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ‘শান্তিবৃক্ষ’ উপাধি পাওয়া শেখ হাসিনা

স্পষ্টকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘আমরা ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাতের অবসান চাই। নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শান্তি দিতে গিয়ে নারী, শিশুসহ গোটা মানবজাতিকেই শান্তি দেওয়া হয়।’ আমাদের মনে রাখতে হবে শেখ হাসিনা ইউনেস্কো থেকে একবার ‘শান্তিবৃক্ষ’ আরেকবার ‘হপে বোয়ানি’ শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস ভূমিকা রাখায় ‘এম কে গান্ধী’ ‘টেগোর শান্তি’ পুরস্কার লাভ করেছেন। ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ার কারণে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ উপাধি পেয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও উন্নয়নে অবদান রাখায় তাঁকে ‘ডক্টর অব লিটারেচার’ প্রদান করেছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্গবন্ধুর ‘জুলিও-কুরি’ শান্তি পদকপ্রাপ্তির দিন স্মরণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল আদর্শের শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেই বীজমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হবে। তবেই বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কোনো সংকট মোকাবিলায় বিশ্ববাসী সক্ষম হবে। ক্ষেপনাস্রবিহীন আকাশে অবাধে উড়ে বেড়াতে পারবে শান্তির দূত পায়রা।

#

(লেখক: তথ্য অধিদফতরে সিনিয়র তথ্য অফিসার হিসাবে কর্মরত)

পিআইডি ফিচার